কিশোর-কিশোরীদের আত্মহত্যা প্রবণতা বেড়েছে

ইরানী বিশ্বাস

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে প্রতিবছর সারাবিশ্বে যে সব কারণে মানুষের মৃত্যু ঘটে তার মধ্যে আত্মহত্যা ১৩তম কারণ। সাধারণত কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বেশি দেখা যায়। এছাড়া ৩৫ বছরের নিচে যাদের বয়স তাদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। তবে নারীদের তুলনায় পুরুষদের মধ্যে আত্মহত্যার হার ৩ থেকে ৪ গুন বেশি। 'আত্মহত্যা' অর্থাৎ নিজের ইচ্ছায় জীবননাশের প্রক্রিয়া। ল্যাটিন শব্দ 'সুই-সেইডেয়ার' থেকে ইংরেজি 'সুইসাইড' শব্দটি এসেছে। যার অর্থ নিজেকে হত্যা করা।

প্রাচীন এথেন্সে রাষ্ট্রের অনুমোদন ব্যতিরেকে আত্মহত্যা করলে তাকে সাধারণ কবরস্থানে দাফন করা হতো না। এমনকি তার জন্য কোনো স্মৃতিফলকও ব্যবহার করতে দেওয়া হতো না। তবে সামরিক পরাজয় মোকাবেলা করার জন্য এটি গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি বলে মনে করা হতো। প্রাচীন রোমে কিছু কারণে আত্মহত্যাকে বৈধ ধরা হতো। যেমন গ্ল্যাডিয়েটর যুদ্ধে স্বেচ্ছামৃত্যু, অন্যের জীবন বাঁচাতে, অন্যের জীবন রক্ষা করতে, শোকের ফলে, ধর্ষণের লজ্জা থেকে মুক্তি পেতে, শারীরিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে।

প্রতিবছর বিশ্বে প্রায় ১০ লাখেরও বেশি মানুষ আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার পরিকল্পনা করা ও প্রচেষ্টা চালিয়ে বেঁচে যাওয়া মানুষের সংখ্যা এর কয়েকগুন। বাংলাদেশে প্রতিবছর কমপক্ষে ১৩/১৪ হাজার মানুষ আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যা প্রবণতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দশম। গত একযুগে প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, এই হার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। ২০১৯-২০ করোনাকালিন সময়ে বাংলাদেশে আত্মহত্যা করেছেন ১৪ হাজার ৪৩৬ জন। যাদের মধ্যে ২০-৩৫ বছর বয়সী নারী-পুরুষের সংখ্যা বেশি।

'ব্রিটিশ জার্নাল অব সাইকিয়াট্রি ওপেন' নামের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক জার্নালে ২০২১ সালে বাংলাদেশে আত্মহত্যার কারণ নিয়ে একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, আত্মহত্যায় মৃত ব্যক্তিদের ৬১ শতাংশই ভুগছিলেন কোনো না কোনো মানসিক রোগে। বাকি ৩৯ শতাংশ ছিলেন বিষণ্নতা রোগে আক্রান্ত। এছাড়া হতাশা, গ্লানি, ব্যর্থতা কিংবা তীব্র অপমানের কারণে মানুষের মনে জন্ম নেয় একরাশ অভিমান। অভিমান থেকে বেরিয়ে আসতে না পারার কারণে তা ক্রমে তীব্র আকার ধারণ করে। এমন পরিস্থিতিতে একসময় নিজেকে মূল্যহীন মনে করতে থাকে। বেঁচে থাকার উৎসাহ হারিয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

হতাশায় থাকা ব্যক্তির প্রতি পরিবারের যেমন কর্তব্য আছে; তেমনি সমাজেরও অবশ্যই দায়িত্ব আছে। কারণ একটি প্রচেষ্টা একটি প্রাণকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারে। হতাশা কাটিয়ে ওঠা মানুষ বা আত্মহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া মানুষ নতুন জীবন ফিরে পাওয়ার পর অধিকাংশই নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন।

অনেক সময় পারিবারিক নির্যাতন, কলহ, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, পরীক্ষা ও প্রেমে ব্যর্থতা, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, প্রাত্যহিক জীবনের অস্থিরতা, নৈতিক অবক্ষয়, মাদক ইত্যাদি কারণে মানুষ আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। আত্মহত্যার কিছু কারণ নির্ধারণ করা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: পরিবারের কারো উপর রাগ করা, শিক্ষাক্ষেত্রে অকৃতকার্য হওয়া, ঋণগ্রস্ততা, পরকীয়ায় জড়ানো, সঙ্গীর পরকীয়ার খবর জেনে যাওয়া, বিবাহ বিচ্ছেদ, যৌন নির্যাতন, পারিবারিক তীব্র অভিমান।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, প্রায় ১০ শতাংশ আত্মহত্যার ক্ষেত্রে কোনো রকমের মানসিক রোগ জড়িত ছিল। শুধু তা-ই নয়, এ ক্ষেত্রে আত্মহত্যাকারী রোগী ও সাধারণ মানুষের মস্তিষ্কের গঠন এবং স্নায়ুতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলোর মধ্যেও রয়েছে পার্থক্য। এছাড়াও মানুষ জেনেটিক বা বংশগত ভাবেও আত্মহত্যাপ্রবণ হতে পারে।

প্রায় ২৭% থেকে ৯০%-এরও বেশি ক্ষেত্রে আত্মহত্যার সাথে মানসিক অসুখের সম্পর্ক থাকে। এশিয়াতে, মানসিক রোগের হার পশ্চিমা দেশের তুলনায় অনেক কম। যাদেরকে সাইকিয়াট্রিক ইউনিটে ভর্তি করা হয়ে থাকে তাদের আত্মহত্যার ঝুঁকি থাকে ৮.৬%। আত্মহত্যার মাধ্যমে যারা মারা যায় তাদের প্রায় অর্ধেকের মধ্যে জটিল ডিপ্রেশন থাকতে পারে। অন্য মানসিক রোগের মধ্যে বাইপোলার ডিসঅর্ডার আত্মহত্যার জন্য ২০ গুনের বেশি ঝুঁকি বাড়ায়। অন্যান্য অবস্থার মধ্যে রয়েছে সিজোফ্রেনিয়া, ব্যক্তিত্বের রোগ, দ্বিপক্ষীয় ব্যাধি, মোটা হওয়া জনিত ব্যাধি এবং স্ট্রেস ডিসঅর্ডার।

অনুমান করা হয়, যারা আত্মহত্যা করেন তাদের প্রায় অর্ধেকের মধ্যে স্বতন্ত্র রোগের আবির্ভাব ঘটতে পারে। সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্তদের মধ্যে প্রায় ৫% মানুষ আত্মহত্যা করেন। প্রায় ৮০% আত্মহত্যা করেছেন যারা মৃত্যুর আগে এক বছরের মধ্যে ডাক্তার দেখিয়েছেন। যারা সম্প্রতি ডাক্তার দেখিয়েছেন তাদের মধ্যে প্রায় ৪৫% আত্মহত্যা করেছেন।

মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়ায়। এ ছাড়া বন্ধু, আত্মীয়, পরিবারের অবিবেচকের মতো ব্যবহার, পরিবারের প্রত্যাশা মেটাতে না পারার হতাশা, সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষের অর্জনের সাথে নিজের অর্জনের তুলনা করার কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিষণ্নতা ও হতাশার হার বাড়ছে। এই বিষণ্নতা ও হতাশা এক সময় তাদের আত্মহত্যাপ্রবণ করে তুলছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরিবার তথা সমাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খারাপ কাজে যতটা সমালোচনা হয়, ভালো কাজে ততটা প্রশংসা করা হয় না। বর্তমান সময়ে স্যোসাল মিডিয়ার কারণে খুব সহজেই একজনের প্রতিদিনের খবর জানা যায়। এ কারণে অদৃশ্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। একজন মানুষকে সব ক্ষেত্রে অন্যজনের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। অনেক সময় ব্যক্তি নিজেও সেলফ ক্রিনিং অর্থাৎ আত্ম-পর্যালোচনা করার কারণে বিষণ্নতায় ভোগেন। তিনি মনে করেন সে যখন পারে, আমি কেন পারছি না। আবার পরিবার বিচার করছে, অন্যজন কি করছে আর সে কি করতে পারছে না।

অথচ তারা বুঝতেই চেষ্টা করছেন না, কোনো মানুষকে তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের জন্য গ্রহণ করতে না পারা, সবসময় অন্যের সঙ্গে তুলনা করা, কোনো কিছু নিজের মনের মতো না হলে প্রতি পদে পদে হেয় প্রতিপন্ন করা ঠিক নয়। এভাবে ধীরে ধীরে সেই মানুষটি সমাজ থেকে একা হতে থাকে। নিঃসঙ্গ জীবনে আসে বিষণ্নতা। শুরুর দিকে যদি বিষণ্নতার চিকিৎসা না করা হয় তাহলে এক সময় মানুষ আত্মহত্যাপ্রবণ হয়ে ওঠে।

সম্প্রতি একটি আত্মহত্যা নিয়ে জনমনে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা গেছে। বাংলা চলচ্চিত্রের নায়ক রিয়াজের শ্বশুর সোস্যাল মিডিয়ায় লাইভে এতে নিজের লাইসেন্স করা অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক। এই আত্মহত্যার কারণ হিসেবে মনোচিকিৎসকদের ধারণা, ব্যবসায়ে ক্ষতি, পরিবার থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে তিনি মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। তিনি বেঁচে থাকতে হয়তো তার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কেউ চিন্তা করেনি। প্রতিবেশী বা কাছের মানুষ কেউ যদি সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দিতেন তাহলে ব্যক্তিটি অন্তত আত্মহত্যার হাত থেকে বেঁচে যেতেন।

আত্মহত্যা মূলত একটি মানসিক অসুখ। যা চিকিৎসার মাধ্যমে সারিয়ে তোলা সম্ভব। মনস্তাত্ত্বিক বিশেষত, দ্বান্দ্বিক আচরণের জন্য থেরাপি কিশোর কিশোরীদের মধ্যে আত্মহত্যা হ্রাস করে। থেরাপি উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা প্রাপ্তবয়স্কদের আত্মহত্যার চেষ্টা হ্রাসে সহায়ক হতে পারে। যদিও পুরোপুরি আত্মহত্যা প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার প্রমাণ এখানো মেলেনি। তবে চেষ্টা করতে ক্ষতি নাই। পরিশেষে বলা প্রয়োজন, দেশে আত্মহত্যার প্রবণতাকে এখনো মানসিক রোগ হিসেবে ধরা হয় না। যার কারণে ভুক্তভোগি ব্যক্তি বা তার পরিবার ডাক্তারের কাছে যাওয়া বা চিকিৎসা নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে না। যার ফলে দিন দিন বেড়েই চলছে আত্মহত্যা।